দৈনিক বাংলা
তারিখ 30 JAN 1992 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

লুঙ্গি-গেঞ্জি প্যান্ট-শার্ট আর গণশিক্ষা অভিযান

গণশিক্ষার জন্য এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ক্লাস রুমের ব্যবস্থা এবং ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি অপরিহার্য নয়

এই সমাজে সীমাহীন দারিদ্র্য। এমনিতেই মানুষের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। তার ওপর শিক্ষাও নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গত দশ বছরের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, যেসব দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়েছে, তারা দরিদ্রতম দেশের কাতারে পড়ে থাকেনি। শিক্ষার অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে জীবনমান, বেড়েছে মাথাপিছু আয়ও। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকেই এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষিত থেকেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিশ বছরেও শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কার্যত কোন উন্নতি সাধন করতে পারিনি। ৭৬ সাল পর্যন্ত এই দেশে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। এর মাঝখানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছিলেন, তাতে সামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও পরবর্তীকালে এরশাদ সরকার তা পরিত্যাগ করে। ফলে অগ্রগতির সে ধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওই কর্মসূচীর ফলে দেশে সাক্ষরের হার দাঁড়িয়েছিল ২৯.২ শতাংশে। অথচ ৯১ সালে এসে তা কমে আবার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশে। এরশাদের সামরিক সরকার ১৯৮২ সালে "উক্ত প্রকল্পটির কাজ অসন্তোষজনক পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা স্থগিতকরণের" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে ১৯৮৭-৮৮ সালে গণশিক্ষা বাস্তবায়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১০ কোটি টাকা। কিন্তু তাতে '৮৮ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় করা হয় মাত্র ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়।

কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই পেছনমুখী প্রবণতা রোধ করতে না পারলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে; অর্থনৈতিক অগ্রসরতার পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার সারা দেশে পর্যায়ক্রমিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীর অধীনে ৬৪টি থানা সদরে ৬৪টি স্কুলকে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুলে যাবার উপযোগী ছাত্রদের এই স্কুলের আওতায় আনা হবে এবং তারা যাতে পাঁচ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল দেড় কোটি। ধারণা করি, ১৯৯১ সালে তা আরও বেড়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে অবশ্য বলা হয়েছিল যে এদের মধ্যে ৭৮ দশমিক ২১ ভাগ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সেই পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া বিভিন্ন খবরে দেখা যায়, স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের ৭০ শতাংশই রয়ে গেছে এই আওতার বাইরে। সম্প্রতি এক সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সরকারী বেসরকারী মিলে স্কুলের সংখ্যা ৩৩৪টি। সেসব স্কুলে নাম লিখিয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৩৭৫ জন ছাত্র। কিন্তু তারা স্কুলে যাবার উপযোগী ছেলেমেয়েদের মাত্র ৩০ শতাংশ। প্রায় একই ধরনের খবর পাওয়া যায় অন্যান্য এলাকা থেকে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে সারথী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, তা দীর্ঘমেয়াদী এবং আশাবাদীর দৃষ্টিতে সম্ভবত দৃঢ়ভিত্তিক।

কিন্তু এই শিক্ষাকে সর্বজনীন ভিত্তি দেবার জন্য এবং দ্রুত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দরকার স্বল্পমেয়াদী ও জরুরী গণশিক্ষা কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে একই সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা এবং শিশু শিক্ষা।

প্রাইমারী শিক্ষার অন্তরায় হিসাবে সব সময় যে বিষয়টিকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তা হল দারিদ্র্য। বলা হয়, স্কুলে পাঠানোর চেয়ে দু'চার পয়সা আয় হয়, এমন কাজেই দরিদ্র শিক্ষাবঞ্চিত পিতামাতা তাদের শিশু সন্তানদের নিয়োগ করেন। অনেক সময় এসব শিশু অভিভাবকদের ক্ষেতের কাজেও সাহায্য করে।

তাছাড়া স্কুলে যাবার জন্য চাই ভাল কাপড়-চোপড়, খাতা-কলম ইত্যাদি।

এই সমাজে যে সীমাহীন দারিদ্র্য আছে, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। তাই বলে শিক্ষার ন্যূনতম সযোগ থেকে দেশের ভাবী নাগরিকরা বঞ্চিত থাকবে তাও কেউ কামনা করেন না।

দুভাবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রথমত শিশুরা যেভাবে বাড়িতে থাকে বা মাঠে কাজ করে, সেভাবেই তাদের স্কুলে পাঠনো। অর্থাৎ সাধারণ হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি বা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরেই তাদের স্কুলে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। শিশু যদি ওই পোশাকে বাবা-মার সঙ্গে থাকতে পারে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে, তা হলে স্কুলের শিক্ষকদের সামনে যেতে পারবে না কেন। তাছাড়া গ্রামের স্কুলে অন্য যারা তুলনামূলকভাবে ভাল পোশাক পরে পড়তে যায়, তারাও স্কুলের বাইরে তাদের খেলার সাথী। অন্য সময় ওই পোশাকে তাদের সঙ্গে মিশতে পারলে স্কুলে পারবে না কেন। কার্যত আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই এক ধরনের বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ার শিকার, আত্মীকরণের প্রক্রিয়া এতে নেই বললেই চলে।

এই উদ্বুদ্ধ করার কাজে স্কুল শিক্ষকদের ভূমিকা হতে পারে সবচেয়ে বেশি। তারা শ্রেণীকক্ষে যদি ভাল পোশাক মন্দ পোশাকের ব্যবধান তুলে দিতে পারেন, তাহলে স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে হীনমন্যতার অবসান ঘটবে এবং নিঃসংশয়ে বলা যায়, ড্রপ-আউটের সংখ্যা কমবে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক বাস্তবতাই এই যে, শিশুদের মাঠের কাজে, কৃষিকাজে অভিভাবকদের সহায়তা করতে হয়। কিন্তু সেই সহায়তা কখনও একজন বয়স্ক লোকের মত সারাদিনের নয়। এরা যখন কাজে নিয়োজিত থাকে না, তখন তাদের সংগঠিত করে এমনকি ক্ষেতের আলের পাশে বসেই অক্ষরজ্ঞান দেয়া সম্ভব। কে নেবে এই দায়িত্ব?

প্রতিটি গ্রামেই এরকম শত শত শিক্ষিত বেকার আধা-বেকার লোক আছেন যারা সামান্য নগদ অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় এই সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হতে আগ্রহী। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা এই লোকদের নিয়োগ করার দায়িত্ব নিতে পারেন। সম্ভাব্য শিক্ষকরা নিজেরাই ছাত্র জোগাড় করে এই দায়িত্ব নিতে পারবেন। ক্ষেতের আলে, বড় বাড়ির বারান্দায়, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন চত্বরে এদের বসিয়ে শিক্ষা দিতে পারেন সম্ভাব্য শিক্ষায়। তার জন্য একটি ব্ল্যাক বোর্ড, স্লেট-পেন্সিলই যথেষ্ট। ব্যাপারটা অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা তো আমাদের শৈশবেও স্লেট-পেন্সিলে লিখে লেখাপড়া শিখেছি, সে সত্যও অস্বীকার করা যাবে না।

প্রায় একই পদ্ধতিতে সন্ধ্যার পরে বয়স্ক শিক্ষার স্কুল বসতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে চিত্তবিনোদন ব্যবস্থাও যুক্ত করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার বিষয়টিও আসে। একটি পরিবারের গৃহিণী যদি শিক্ষিত বা সাক্ষর হন, তবে তার সন্তানেরা যে সাক্ষর হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যা সমান হলেও নারীদের শিক্ষার হার কম ১৬ শতাংশের মত। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা বিনা বেতনে করা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সে দিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮৫-৮৬ সালে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে মোট শিক্ষার্থী ছিল তিন লক্ষ ৮ হাজার ৩৬১ জন। তার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ১৭৪ জন; '৮৬-'৮৭ সালে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ১৪ হাজার ৫৩৩ জন, ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৩ হাজার ৫৯৯ জন। '৮৭-৮৮ সালে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯২৪ জন, তার মধ্যে ছাত্রী ছিল ১ লাখ ৪ হাজার ৬২৩ জন। '৮৮-৮৯ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৭২,৬০২ জন, ছাত্রী সংখ্যা ১ লাখ ১৭৬ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই হার আরও কম। ১৯৮৭-'৮৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪ হাজার ১১ জন, তার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোটে ২৬ হাজার ৬২৮ জন। '৮৮-'৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১,৩৪,২৪৫ জন, ছাত্রী ছিল ২৮,৪৮১ জন।

এই পরিস্থিতির উন্নয়নেও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে পুনরায় বলতে চাই, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের কর্মসূচী সকল রকম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং ভিত্তি। তাই সংক্ষিপ্ত সময়ে বেশি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপক কর্মসূচী এখনই হাতে নেয়া প্রয়োজন।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী